বছরের আলোচিত চরিত্র জঙ্গি

অনিরুদ্ধ ইসলাম

বাংলা ভাষায় 'জঙ্গি' বলতে বোঝায় রণোন্মুখ তেজোদীপ্ত মানুষকে। আন্দোলন-সংগ্রামে জঙ্গি স্লোগান মানুষকে উদীপ্ত করে। তেজী মনোভাবে মানুষকে জাগ্রত করে। কিন্তু সেই 'জঙ্গি' যখন গ্রেনেড-বোমায় সজ্জিত হয়ে মানুষ হত্যায় মেতে ওঠে, আত্মঘাতী বোমা হামলায় আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুসহ নিজেকেও নিশ্চিহ্ন করে তখন মানুষ তাকে ভয়ানক হিসাবে চেনে। সম্প্রতি সময়ে এই 'জঙ্গি' ও 'জঙ্গিবাদ'কে এ দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে গভীর ঘৃণায় ও আতঙ্কে। 'জঙ্গি' দমনে শেষ পর্যন্ত সরকার সচকিত হয়েছে। দেশজুড়ে চলছে 'জঙ্গি' গ্রেপ্তার অভিযান। রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে, বিরোধে-বিতর্কে রয়েছে এই 'জঙ্গি' প্রাঙ্গণ। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এই জঙ্গি প্রাঙ্গণকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। অনেকে জঙ্গি তৎপরতা বেশি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেলে বিদেশী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। সব মিলিয়ে বিদায়ী বছরে এই 'জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ' ছিল বাংলাদেশের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। শায়খ আবদুর রহমান, বাংলা ভাই, মুফতি হান্নান, আতাউর রহমান সানি, মওলানা গালিব প্রমুখ জঙ্গি নেতারা বছরের আলোচিত চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

বাংলাদেশে এই জঙ্গি ও জঙ্গিবাদের উত্থান নতুন ঘটনা নয়। পঁচাত্তর পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজে পুনর্বাসিত হয়ে জামায়াতে ইসলামী ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী ছাত্র শিবিরের মাধ্যমে রগকাটা, চোখ তোলা জাতীয় সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্ম দেয়। বাংলাদেশে বর্তমানে যে জঙ্গি তৎপরতা চলছে তার উৎপত্তি সূত্র এখানেই। এ যাবৎ যে সব জঙ্গিরা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা কোনো না কোনো সময় জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এখনও সম্পৃক্ত আছে। বাংলাদেশে তৎপর জঙ্গিরা এই জামায়াতে ইসলামীর কাছে এবং তাদের মাধ্যমে জোট সরকারের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ছত্রছায়া পেয়েছে। জামায়াতে ইসলামী অবশ্য দেশের সাংবিধানিক রাজনীতিতে নিজেদের একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের এই উগ্রপন্থাকে সব সময়ই আড়াল করে রাখতে চেয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গন সমূহে ইসলামী ছাত্র শিবিরের মাধ্যমে তারা যে সমস্ত সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হয়, তাকে তারা নিছক আত্মরক্ষামূলক কৌশল হিসেবে বর্ণনা করেছে। কিন্তু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে যে 'সিরাজুস সালেহীন', 'কেরামতিয়া বাহিনী', 'হেকমতিয়া বাহিনী' শিবিরের সংগঠিত সশস্ত্র সংগঠন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-মাদ্রাসাগুলো থেকে তাদের ক্যাডার সংগ্রহ করে নিজেদের দুর্ধর্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলেছে। জামায়াতের

রাজনীতির অনুসারী হিসেবে তারা অবশ্য জামায়াতের রণকৌশল দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই সশস্ত্র সংগঠন হিসেবে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে রোহিঙ্গা বিদ্রোহী এবং ভারতের বিভিন্ন নামের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জামায়াতের এই সংগঠনগুলোর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উখিয়া, নাইক্ষ্যংছড়িসহ চট্টগ্রামে সম্প্রতি যেসব জঙ্গি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও অস্ত্র ভান্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে, সে সব জামায়াত-শিবির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতসহ মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক-স্বাধীনতা বিরোধীচক্রের পুনর্বাসনের এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবেও ইসলামী মৌলবাদের উত্থান ঘটে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর বিপ্লব আকাংক্ষায় উন্মুখ হয়ে ওঠে বিভিন্ন দেশের মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো। আলজেরিয়া, সুদানে ধর্মবাদী রাজনীতির প্রতিষ্ঠায় সহিংস সংঘাত ও দীর্ঘ সময় ব্যাপী রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। তবে ইসলামী জঙ্গিবাদী সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে আফগানিস্তানে সোভিয়েট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ‘আফগান মুজাহিদদের’ সশস্ত্র প্রতিরোধ লড়াইকে কেন্দ্র করে। আফগানিস্তানে সোভিয়েট সেনা অভিযানের বিরুদ্ধে যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইসলামী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে এক করে, তেমনি ঐ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মার্কিনি সহায়তায় গড়ে তোলা হয় ইসলামী জঙ্গি নেটওয়ার্ক। বর্তমানে আমেরিকার এক নম্বর শত্রু আল-কায়দা ও ওসামা-বিন-লাদেন। অথচ প্রত্যক্ষ মার্কিন সহায়তায় লাদেন সোভিয়েট বিরোধী লড়াইয়ে যোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের শরণার্থী শিবিরগুলো থেকে সংগৃহীত করা হয় এসব যোদ্ধাদের। এবং মূলত পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোতে মার্কিনি তত্ত্বাবধানে এবং পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দাবাহিনীর (আইএসআই) সহায়তায় গড়ে তোলা হয় তালেবানি বাহিনী। বস্তুত এই তালেবানি বাহিনী বর্তমান বিশ্বের ইসলামী জঙ্গি বাহিনীর মূল অনুপ্রেরণার স্থল। সেই সময় ‘জিহাদে’ যোগ দিতে বাংলাদেশ থেকে কিছু তরুণ পাড়ি জমায় সুদূর আফাগানিস্তানে এভাবে। এই তালেবান বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে গড়ে ওঠে বাংলাদেশের।

২.

নব্বই দশকের শুরুর দিকে আফগানিস্তানে সোভিয়েট বাহিনীর পশ্চাদপসরণের পর সেখান থেকে ফিরে আসা বাংলাদেশী ইসলামী যোদ্ধারা তাদের আল-কায়দাসহ পাকিস্তানভিত্তিক বিভিন্ন ইসলামী জঙ্গি সংগঠনসমূহের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। আগেই বলা হয়েছে

পঁচাত্তর পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজে পুনর্বাসিত হয়ে জামায়াতে ইসলামী ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী ছাত্র শিবিরের মাধ্যমে রগকাটা, চোখ তোলা জাতীয় সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্ম দেয়

জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ছাত্রছায়া ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের লোকবল এদের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ক্রমেই এরা নিজেদের দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা, বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে তাদের এসব জঙ্গি নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি ঘটায়। ঘাতক দালাল নির্মূল বিরোধী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীকে কোণঠাসা করে ফেললে জামায়াত বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নামে ওদের মাঠে নামায়। এ সময় পল্টন ময়দানে এক সমাবেশে মুফতি হান্নান, মুফতি আমিনী প্রমুখ প্রকাশ্যেই বাংলাদেশে আফগানিস্তানের স্টাইলে তালেবানি শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। কিন্তু সে সময় একমাত্র বামপন্থী কিছু সংগঠন ছাড়া দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের এই আন্দোলন হিসাবে নেয়নি। বরং জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামী দল ও সংগঠনগুলোকে পক্ষে রাখতে ক্ষমতালোভী দুটি প্রধান দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। বিএনপিকে সমর্থনের বিনিময়ে জামায়াত ইতিমধ্যে রাজনীতিতে তাদের জায়গা করে নিয়েছে। আবার বিএনপি বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জামায়াত নিজেদের রাজনৈতিক বৈধতাকে পোক্ত করে। বাংলাদেশে জঙ্গি উত্থান সম্পর্কে এখন যে সব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় যে, এই সময়কালে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনসমূহের আনাগোনা শুরু হয়। এই সময়কালে বেশ কিছু অস্ত্রের চালানও ধরা পড়ে। কিন্তু তৎকালীন প্রশাসন সে সব সম্পর্কে কোনো প্রকার তথ্য বেমালুম গায়েব করে দেয়। এর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র চালানটি ছিল কক্সবাজার উপকূলে ধরা পড়া চালান। সেনাবাহিনী ওই অস্ত্রসমূহ জব্দ করলেও সে সম্পর্কে আর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

৩.

ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক তৎপরতার নতুন শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। আওয়ামী লীগ জামায়াতের সঙ্গে তার তথাকথিত কৌশলগত মিত্রতার কারণে নির্মূল কমিটির আন্দোলনকে কার্যত শেষ করে দিয়েছিল। সেদিক দিয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শক্তি একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি ২১ বছর পর ক্ষমতায় ফিরে এসে আওয়ামী লীগ যে লুটপাট, সন্ত্রাস, দখলের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তার থেকে সৃষ্ট হতাশাকে ভিত্তি করে বিএনপি সাম্প্রদায়িক স্লোগান তুলে আবার মাঠে ফিরে আসে। তার সঙ্গে এবার জামায়াতের পাশাপাশি ইসলামপন্থি অন্য দলগুলো সম্পৃক্ত হয়। আওয়ামী লীগ সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য শান্তিচুক্তি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা-এসবই বিএনপি ও তার মিত্রদের সাম্প্রদায়িক প্রচারের লক্ষ্য হয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, অনাচার, দলীয়করণ, পারিবারিক রাজনীতিও দেশবাসীর মধ্যে বিশেষ ক্ষুব্ধতা সৃষ্টি করে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও আওয়ামী শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

ইসলামী গোষ্ঠীগুলোর এই সময় মূল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় এনজিওসমূহ। এসব এনজিও ফতোয়াবাজি মৌলবাদী ধ্যানধারণার বিরোধিতা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসারের ব্যাপারে যে সব পদক্ষেপ নেয় তার বিরোধিতায় এই ইসলামী সংগঠনসমূহ সোচ্চার হয়ে ওঠে। বস্তুত ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঢাকায় এনজিওদের সমাবেশে বাধাদানের ঘটনা ইসলামী গোষ্ঠীগুলোকে আওয়ামী লীগের মুখোমুখি দাঁড় করায়। কিন্তু আওয়ামী লীগ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে বরং আপস-সমঝোতার পক্ষ নেয়। শেখ হাসিনা মাদ্রাসাগুলোর জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেন। কিন্তু এর কিছুই ইসলামী গোষ্ঠীগুলোকে বিরত করতে পারেনি। তাদের এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে বিএনপি চারদলের জোট গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগের বিরোধিতায় আন্দোলন গড়ে তোলে।

৪.

বস্তুত আওয়ামী লীগের শাসনামলের মধ্যভাগে ১৯৯৯ সালে যশোরে উদীচীর সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বোমা হামলার মধ্য দিয়ে ইসলামী জঙ্গিদের সশস্ত্র তৎপরতার সূচনা হয়। উদীচীর ঘটনায় এসব ইসলামী গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলেও, বিরোধী

বিএনপিকে নাজেহাল করতে আওয়ামী লীগ উদীচী মামলাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, সিপিবি'র সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলেও তার তদন্তানুষ্ঠানও বেশিদূর এগোয়নি। সর্বশেষ গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় ৭০ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে রাখা উদ্ধারের ঘটনা এবং তার পরিকল্পক হিসেবে হরকাতুল জেহাদ নেতা মুফতি হান্নানের নাম প্রকাশ পাওয়ায় বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গি তৎপরতার কিছু চিত্র বেরিয়ে আসে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেয়নি।

৫.

এই প্রেক্ষাপটেই ২০০১-এর নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত চারদলের জোটের বিপুল ভোটে নির্বাচনী বিজয় লাভ বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গি তৎপরতার উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এবার আর ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যেতে কোনো বাধা রইল না। রাজনৈতিকভাবে জোটের ছত্রছায়ায় তো বটেই,

‘সিরাজুস সালেহীন’, ‘কেরামতিয়া বাহিনী’, ‘হেকমতিয়া বাহিনী’ শিবিরের সংগঠিত সশস্ত্র সংগঠন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-মাদ্রাসাগুলো থেকে তাদের ক্যাডার সংগ্রহ করে নিজেদের দুর্ধর্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলেছে

প্রাথমিকভাবেও তারা সরকার, বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা পেতে থাকে। বাংলাদেশে বিস্তৃত জঙ্গি নেটওয়ার্ক সম্পর্কে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে থাকে এবং সে সব ব্যাপারে কোনো প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না। এই সময় প্রথম ময়মনসিংহ সিনেমা হল, পরে সিলেটে শাহজালালের মাজারের ওরসে, ওই একই স্থানে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে লক্ষ্য করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, মাজার, গির্জা, ওরস, যাত্রা, সার্কাসে ধারাবাহিকভাবে গ্রেনেড ও বোমা হামলার ঘটনা ঘটতে থাকে। আওয়ামী লীগ সরকারের মতো বিএনপি সরকারও এসব বোমাবাজির ঘটনাকে সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য বিরোধী দলের কাজ বলে অভিহিত করে। ময়মনসিংহ সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বিরোধদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী, ময়মনসিংহের প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যক্ষ মতিউর রহমান ও তার পুত্রসহ আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ কর্মীদের গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করা হয় ও দীর্ঘদিন আটক রাখা হয়। ময়মনসিংহ সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গঠিত বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন ওই ঘটনার কোনো হদিস করতে পারেনি। অথচ বর্তমানে জঙ্গি অভিযানে ধৃত জঙ্গিদের স্বীকারোক্তি মতে, উদীচী থেকে শুরু করে ময়মনসিংহ সিনেমা হল পর্যন্ত বোমা হামলায় এসব ইসলামী সংগঠনের হাত ছিল। তারা টেস্ট কেইস হিসেবে এসব আক্রমণ পরিচালনা করছে।

৬.

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসব ইসলামী জঙ্গি নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি ও তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ইসলামী জঙ্গি সংগঠনসমূহের সম্পর্কের বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে পাকিস্তানের ডেইলি টাইমস এসব জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে পাকিস্তানি সম্পর্কের বিষয় তাদের প্রতিবেদনে বিশেষভাবে তুলে ধরে। কিন্তু সরকার ওইসব রিপোর্ট বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী আন্তর্জাতিক প্রোপাগান্ডা বলে অভিহিত করে। দেশের বুদ্ধিজীবীদের একাংশও সরকারের সুরে সুর মেলায়। জঙ্গি সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য যেসব সাংবাদিক বাংলাদেশে আসতে আগ্রহী ছিলেন তাদের অনুমতি দেয়া বন্ধ রাখা হয়। পক্ষান্তরে যারাই পরিচয় এড়িয়ে আসতে সক্ষম হন তাদের কয়েকজনকে নিবর্তনমূলকভাবে আটক করে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাদের সহযোগিতা করার জন্য কয়েকজন দেশীয় সাংবাদিককে গ্রেপ্তার, মামলার আসামি করাসহ চরম হেনস্তা করা হয়। এ ধরনের কয়েকজন সাংবাদিক আরো হয়রানির ভয়ে দেশ ত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছেন।

৭.

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের এই চার বছরে ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের নেটওয়ার্ক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে বড় দুটি অস্ত্র চালান এবং জঙ্গিদের সঙ্গে পুলিশি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই দুটো অস্ত্র চালানের একটি ছিল চট্টগ্রামে, অপরটি বগুড়ায়। চট্টগ্রামের সার কারখানা ঘাটে পুলিশের হাতে দশ ট্রাক ভারী অস্ত্রসহ গ্রেনেডের চালান ধরা পড়ে। এ যাবৎ ঐ ঘটনার তদন্তে কিছু কেরিয়ার শ্রমিক ও বন্দোবস্ত কন্ট্রাক্টর ছাড়া আর কেউ ধরা পড়েনি। ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে ওই মামলার চার্জশিট দু'বার ফেরত পাঠায় আদালত। বিশেষ করে ওই চালানের দুটি একে-৪৭ বিক্রি করার সময় গ্রেপ্তারকৃত পুলিশের হাবিলদার ওপরতলার সঙ্গে সম্পর্কের তথ্য দিলেও সবই ধামাচাপা পড়ে আছে।

আর বগুড়ার অস্ত্র উদ্ধারের পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, জব্দ করা গোলাবারুদ দিয়ে অর্ধেক ঢাকা উড়িয়ে দেয়া যেত। কিন্তু তারও কোনো সুস্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশি তদন্ত থেমে গেছে।

অপরদিকে জয়পুরহাটে পুলিশের সঙ্গে জঙ্গিদের সশস্ত্র সংঘর্ষে ধৃত শায়খ আবদুর রহমানের জামাতা আব্দুল আউয়ালকে ছেড়ে দেয়া হয়। বাগেরহাটে বাংলা ভাই ধরা পড়লেও সে ছাড়া পেয়ে যায়।

৮.

এই প্রেক্ষাপটে ২০০৪-এর প্রথম দিকেই বাংলাদেশের জঙ্গি উত্থানের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। উত্তরাঞ্চলের জেলা রাজশাহীতে জামাআতুল মুজাহিদিনের নেতা বাংলা ভাই জাগ্রত মুসলিম জনতা নামে বাহিনী গঠন করে। রাজশাহীর বাগমারায় সর্বহারা দমনের নামে জঙ্গি তৎপরতায় প্রকাশ্য উপস্থিতি ঘোষণা করে। তার ওই তৎপরতায় রাজশাহী পুলিশ, বিএনপির মন্ত্রী-এমপি-মেয়রের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছিল। বাংলা ভাইয়ের জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে রাজশাহীতে রাজনৈতিক ও নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে উঠলে পুলিশের প্রহরায় বাংলা ভাই জেলায় প্রশাসনকে স্মারকলিপি প্রদান করে। সে সময় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদের আইনশৃঙ্খলা-বিষয়ক সাব-কমিটি বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর হয়নি। বরং ওই গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি খেলা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত প্রথমে জামায়াতের আমির নিজামী ও পরে প্রধানমন্ত্রী বাংলা ভাইকে মিডিয়ার সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করলে ‘বাংলা ভাই’ সম্পর্কে প্রশাসনিক সব তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। সংসদেও বিএনপির সাংসদরা বাংলা ভাই, হিন্দি ভাই, ইংরেজ ভাই কাউকে ছাড়া হবে না বলে ব্যঙ্গোক্তি করে বক্তৃতাও দেন।

৯.

এ ধরনের পরিস্থিতিতেই এ বছরের শুরুতে ফেব্রুয়ারি মাসে একেবারে হঠাৎ করেই সরকার জামাআতুল মুজাহিদিন ও জাগ্রহ মুসলিম জনতা বাহিনীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং তাদের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। এই অভিযানে আহলে হাদিস আন্দোলনের নেতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আসাদুল্লাহ গালিব ও তাঁর কয়েকজন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার

করা হয়। সরকারের দৃষ্টি এই আসাদুল্লাহ গালিব ও আহলে হাদিস আন্দোলনের মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং বাংলা ভাই ও অন্যদের গ্রেপ্তারের বিষয়টি আড়ালে পড়ে যায়। দেখা যায়, জঙ্গি সন্দেহে যাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তারা সহজেই ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে।

তবে গত ১৭ আগস্ট দেশের ৬৩টি জেলার ৪৩৫টি স্থানে একই সময়কালে একযোগে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা জঙ্গি ইস্যুকে ব্যাপকভাবে সামনে নিয়ে আসে। এতদিন এই জঙ্গিদের সম্পর্কে সাধারণের বিশেষ ধারণা না থাকলেও ১৭ আগস্টের বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে রেখে যাওয়া প্রচারপত্রে জঙ্গিরা ঘোষণা করে যে, তারা জামাআতুল মুজাহিদিনের পক্ষে ঐ বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, পার্লামেন্ট ও নির্বাচন তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ করে তারা দেশে ইসলামী আইন ও ইসলামী শাসন প্রচলন করতে চায়। এর জন্য তারা 'ক্বিতল বাহিনী'ও গঠন করার করা বলে।

১৭ আগস্ট একযোগে জঙ্গি বোমা বিস্ফোরণ দেশবাসীকে সচকিত, উদ্বিগ্ন করলেও জোট সরকারকে করেনি। তারা প্রথমে এ ঘটনাকে বিরোধী দলের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে। পরবর্তীতে জঙ্গিরা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করলে ঘটনা আর সেই পথে এগোয়নি। তবে প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে মন্ত্রিসভাসহ জাতীয় সংসদে আলোচনার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি। ২০ দিন পর জাতীয় সংসদে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ইসলামের নাম ব্যবহার করে এ ধরনের তৎপরতার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বললেও জঙ্গি ইস্যু সম্পর্কে সরকারের আচরণ পূর্ববতই দ্ব্যর্থবোধক থেকে যায়। প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে বিরোধী দলের সঙ্গেও কোনো আলোচনা করতে চাননি। বরং জোটের শরিক জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট অব্যাহতভাবেই দাবি করতে থাকে যে, ১৭ আগস্টসহ এসব বোমা হামলার পেছনে ভারত, ইসরায়েল ও বিরোধী দলের হতে রয়েছে।

ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতে জঙ্গিরা ধরা পড়তে থাকে, যাদের বেশির ভাগই জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাদের সমর্থন ও তদবির থাকায় অনেকেই ছাড়াও পেয়ে যায়। অথবা তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মামলা দায়ের করা হয়।

ইতিমধ্যে এই জঙ্গিরা তাদের ঘোষণা অনুযায়ী চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুরে আদালতকক্ষে বোমা হামলা চালায়। ঝালকাঠিতে আত্মঘাতী বোমা হামলায় দু'জন বিচারক নিহত হয়েছেন। গাজীপুর, চট্টগ্রাম ও সর্বশেষ নেত্রকোণায় আত্মঘাতী বোমা হামলা ও জঙ্গি তৎপরতায় সমস্ত চিত্রপটই পাল্টে দেয়। এর আগে শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই আলোচনায় থাকলেও এখন এই আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরাই জনমনোযোগের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের কাছে পাঠানো সংলাপের আমন্ত্রণপত্রে ইসলামের অপব্যাখ্যায় বিপথগামী এই আত্মঘাতী বোমা হামলার বিষয়টিই প্রধান হিসেবে এনেছিলেন। এই আত্মঘাতী পথ বেছে নেয়া পাপ, এটাই ইমামদের দিয়ে বলানোর চেষ্টা করেছে সরকার সারা দেশে। অন্যদিকে নেত্রকোনা আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনায় নিহত যাদবকে কেন্দ্র করে এই বোমা হামলাকে সাম্প্রদায়িক প্রলেপ দেয়ারও চেষ্টা হয়। প্রধানমন্ত্রী তার বিশেষ বক্তৃতায় এই বোমাবাজিকে পুঁজি করে বিরোধী দল জোট ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে বলে দাবি করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিগুলোর ঐক্য কেউ ভাঙতে পারবে না।

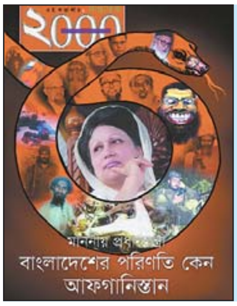

কারা এই 'জঙ্গি'! যারা ধরা পড়েছে তাদের সাংগঠনিক পরিচয় বাদে অধিকাংশই গরিব ঘরের সন্তান ও মাদ্রাসার ছাত্র। আল্লাহর পথ ও বেহশতি পুণ্যলাভের কথা বলে তাদের যে আদর্শিক মোটিভেশন দেয়া হচ্ছে সেটা খুবই দৃঢ়

১০.

প্রধানমন্ত্রী জঙ্গি ইস্যুতে চারদলীয় জোটের ঐক্য ও রাজনীতির যত আড়াল নেয়ার চেষ্টা করুন, অথবা বিরোধী দল একে ধরে সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণিত করুক। এই জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ বাস্তব। এ যাবৎ পাওয়া তথ্যে বাংলাদেশে এ ধরনের ৫৭টি জঙ্গি সংগঠন রয়েছে এবং দৃঢ় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তারা পরস্পর সম্পর্কিত। ধৃত জঙ্গিরা স্বীকার করেছে পাকিস্তান ও সৌদি আরব তাদের অর্থায়ন করছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী এনজিও, বিশেষ করে বাংলাদেশে কর্মরত রিভাইভেল অব ইসলামিক হেরিটেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই জঙ্গিদের রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত ও সামরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোটি কোটি টাকা সরবরাহ করছে। পুলিশে অভিযানে জঙ্গিদের বিস্ফোরকসহ যেসব রসদ পাওয়া গেছে তা খুবই সমান্য। দেশের কওমি মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন মাদ্রাসা এদের জনবল সরবরাহকারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রশাসনে ডিসি-এসপি পর্যায়েও এদের যোগাযোগ রয়েছে। সর্বোপরি বিএনপি নেতা-মন্ত্রীদের একাংশ এবং সংগঠন হিসেবে জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রশিবির ও ইসলামী ঐক্যজোটের বিভিন্ন দল এই জঙ্গিবাদী রাজনীতির সমর্থক, আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মদদদাতা। বিএনপি-জামায়াত জোট ও ভোটের রাজনীতির কারণে এই জঙ্গি ইস্যুর দূরবর্তী সমাধান দূরে থাক আশু সমাধানও সম্ভব হবে না, হচ্ছে না।

১১.

কিন্তু কারা এই 'জঙ্গি'! যারা ধরা পড়েছে তাদের সাংগঠনিক পরিচয় বাদে অধিকাংশই গরিব ঘরের সন্তান ও মাদ্রাসার ছাত্র। আল্লাহর পথ ও বেহশতি পুণ্যলাভের কথা বলে তাদের যে আদর্শিক মোটিভেশন দেয়া হচ্ছে সেটা খুবই দৃঢ়। এ কারণেই আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা যেমন নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি, তেমনি ঐসব হামলার পর যদি বেঁচে গেছে তবে ঐ 'শাহাদত' লাভের কথাই বলেছে। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পিতভাবে মাদ্রাসা থেকে এ ধরনের ছেলে জোগাড় করে তাদের আদর্শিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

তবে যারা ওদের নেতা তারা নিজেরা আত্মঘাতী হবার কথা বলছে না। বরং বলছে যে, তারা এই কাজ চালিয়ে যাবে। শায়খ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাই এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আর এই জঙ্গিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত জামায়াত এই ইস্যুতে নিজেদের একটি মডারেট ইসলামী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করলেও তাদের সঙ্গে জঙ্গিদের সম্পর্কের বিষয়টা প্রকাশ হয়ে পড়ায় তারা কিছুটা বেকায়দায় পড়েছিল। কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি তাদের আশ্বস্ত করেছে, এর ফলে জোটের যেমন ক্ষতি হবে না, তেমনি জামায়াত-শিবিরকে প্রশাসন এই ইস্যুতে হয়রানি করবে না। সুতরাং জঙ্গি ইস্যুতে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে জামায়াত।

অন্যদিকে এই জঙ্গি ঘটনায় বিরোধী দলের নির্বাচনী সংস্কারের ইস্যু পিছিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি কিছুতেই সেটা মানবেন না। জঙ্গি ইস্যুকেই এবং জঙ্গিদেরই তিনি ও তার জোটের বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের সম্ভাবনা আরো বেড়ে গেছে।

সব মিলিয়ে বছরের আলোচিত চরিত্র হিসেবেই নয়, বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্রের অন্যতম হিসেবে জঙ্গি ইস্যু থাকছে, সেটাই বাস্তব।